আলোকপাত

আব্দুল বায়েস

বঙ্গবন্ধুকে কাছ থেকে দেখা : সমকালীন স্মৃতিকথা

"...Bangabandhu was not only 'a friend of Bengal' but his role was more than that and incomparable... he was snatched away from the Bangalis but nobody can snatch his clear thoughts and visions, which may be 'very helpful for us today' - Amartya Sen

১৮ আগস্ট, ২০২১

'বঙ্গবন্ধুকে কাছে থেকে দেখা—সমকালীন স্মৃতিকথা' শিরোনামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে অন্তর্জালে এক অনন্য আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করল বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)। গুরুত্বে এর মহাপরিচালক বিনায়ক সেন, যিনি সভাপতি ও সঞ্চালক, স্মৃতিচারণমূলক ওয়েবিনারের উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার করে জানান দিলেন : 'শোককে শক্তিতে রূপান্তর করতে হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আরো বেশি করে জানতে হবে; জানতে হবে কীভাবে তিনি আদর্শের কারণে উজ্জ্বলতা পেয়েছিলেন।' বলে রাখা দরকার যে যারা বঙ্গবন্ধুর নিবিড় সান্নিধ্যে কাজ করেছেন, সামনাসামনি কথা বলেছেন কিংবা বিভিন্ন দায়িত্বে তার সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন, তাদের কাছ থেকে শোনার জন্য ছিল ওই মহতী আয়োজন। স্বাভাবিকভাবেই সেই আমলের সবাই এখন বর্ষীয়ান, কেউ অশীতিপরও, কিন্তু প্রখর স্মৃতিশক্তির ওপর ভর করে হাজির হয়েছিলেন স্মৃতিকথা শোনাতে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি।

বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য ওয়েবিনার থেকে ধারণকৃত বা শ্রুত বক্তব্যের নির্যাসটুকু পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা। তবে সব নয়, যেমন নয় দুরূহ। শুধু লেখকের মনে গেঁথে যাওয়া নির্বাচিত কিছু কথা ধার করা হবে ওই সেমিনার থেকে। আশা করা যায়, 'মৌখিক ইতিহাসের' মাধ্যমে অর্জিত বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে অতিরিক্ত, অথচ অজানা কিছু জান আহরণ করে সবাই আরো বেশি আলোকিত হতে পারবে; নতুন প্রজন্ম জানতে পারবে এক মহাপ্রাণ তথা মহামানবের অতি সাধারণ দৈনন্দিন জীবন এবং অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কথা।

বলা বাহুল্য, ভাষান্তর ও ভাবান্তর উপস্থাপনের প্রচেষ্টায় প্রচুর ভুলত্রুটি এবং ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থেকে যায়। অতএব, লেখকের পক্ষ থেকে আগাম ক্ষমা প্রার্থনার কাজটি দিয়ে উপস্থাপনা শুরু করছি।

এক। অনুষ্ঠানের প্রথমে ভিডিওর মাধ্যমে বক্তব্য রাখলেন প্রফেসর নুরুল ইসলাম। তিনি বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান এবং প্রথিতযশ্য। একজন অর্থনীতিবিদ। বঙ্গবন্ধু পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমে সদ্য স্বাধীন দেশটি এগিয়ে যাবে চাইতেন। তাই দেশের জন্য একটা প্ল্যানিং কমিশন দরকার। সম্ভবত সেটা মাথায় রেখে খুঁজছিলেন নুরুল ইসলামকে, আগে থেকেই যার ওপর তিনি অবিচল আস্থা স্থাপন করে রেখেছিলেন। এক কথায়, প্রফেসরকে তিনি কমিশনের কাঠামো প্রণয়ন, উদ্দেশ্য ও কৌশল বিষয়ে দায়িত্ব দেয়ার জন্য মুখিয়ে ছিলেন। পরবর্তী সময়ে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন প্রথমত প্রফেসর রেহমান সোবহান, আনিসুর রহমান, মোশারেফ হোসেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার এ কমিশনকে কতটুকু সম্মান ও গুরুত্ব দিত, তার প্রমাণ অপাপক নুরুল ইসলাম পূর্বমন্ত্রীর পদমর্যাদায় এর চেয়ারম্যান আর অন্য সদস্যরা প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় সমাসীন ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর অগাধ বিশ্বাস ছিল প্রফেসর নুরুল ইসলামের ওপর। প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা একদিকে যেমন আনন্দ আনত, অন্যদিকে তেমনি প্রজ্ঞার জন্ম দিত—বঙ্গবন্ধু তাহলে কি আমলাদেরও এমন বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করেন? বঙ্গবন্ধুর উত্তর ছিল এ রকম : আমরা তো শিক্ষকদের পায়ে ধরে সালাম করতাম, শিক্ষকদের সম্মান ও বিশ্বাস না করে যে উপায় নেই।

সুযোগ এবং সময় পেলে অধ্যাপক নুরুল ইসলাম অর্থনীতির বাইরেও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করতেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে—যেমন দুর্ভিক্ষ, বিদেশ নীতি, বাকশাল প্রসঙ্গ ইত্যাদি। বঙ্গবন্ধু বাকশাল করেছিলেন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক নদী পাড়ি দেয়ার জন্য; সে ঝড় থেমে গেলে যে যার নীড়ে যাবে। অলাপচারিতার এক পর্যায়ে একদিন বঙ্গবন্ধু কটপট বলে ফেললেন, 'প্রফেসর সাহেব, আপনি অর্থনীতিতে পিএইচডি আর আমি রাজনীতিতে পিএইচডি; যে যার অবস্থানে থাকি তাই ভালো।'

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন শেষে নুরুল ইসলাম বললেন, স্যার, আমার কাজ শেষ, এখন চলে যেতে চাই। বঙ্গবন্ধু বললেন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করলেন ভালো কথা কিন্তু এটা বাস্তবায়ন করতে হবে না? কোথাও যাওয়া হবে না। তবে ছুটি নিয়ে বিদুদিন ঘুরে আসতে পারেন।

দুর্ভাগ্য, ঘুরে আসার আগেই পীচাত্তরের নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং প্রফেসর নুরুল ইসলামের বিদেশে থেকে যাওয়া।

দুই। বঙ্গবন্ধুর খুব কাছের এবং স্নেহের একজন ছিলেন তার ব্যক্তিগত সচিব মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন—পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এবং ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য; এখন বিশ্ববিদ্যালটির মুখ্য উপদেষ্টা।

তিনি বললেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের একটা ঠিকানা দিয়েছেন, রাষ্ট্র দিয়েছেন, ভবিষ্যতে চলার পথেও সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। তার আমলে যুগান্তকারী কিছু সিদ্ধান্তের কথা অজানা রয়ে যায়। যেমন একবার গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে ১০০ টাকার নোট হাজার হাজার কোটি ছাপা হয়ে বাজারে ঢুকছে, যা অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত এমনকি অচল করে দিতে পারে। একথা শোনা মাত্রই ১০০ টাকার নোট বাতিল করার নির্দেশ এল (ডিমনিটাইজ)। তবে যে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার মধ্যে কাজটি করা হয়েছিল, তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা।

বঙ্গবন্ধুর সরকার সেই আগস্টের প্রথম দিকে গ্যাসচেম্বারলো কিনে নিয়েছিল। সেটা না করলে মালিকানা হাতছাড়া হতো, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ চলে যেত অন্যের হাতে। তিনি নিশ্চয়ই জানতেন যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এ ধরনের দেশাত্মবোধক চিন্তাভাবনা রাষ্ট্রনায়কের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু তিনি যে বঙ্গবন্ধু, সীমাহীন সাহসের প্রতীক—'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

সেই আগস্টের ১৪ তারিখ বঙ্গবন্ধু একটা চিঠি পান, যাতে তার সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে অবগত করা হয়। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'পাকিস্তানি জিনারেল জেনারেলরাই কিছু করতে পারে নাই, বাংলাদেশের পুঁচকারা কিছুই করতে পারবে না।'

জ্যামাইকায় কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দিতে প্লেনে উঠে দেখলেন তৎকালীন কর্নেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্লেনে বসে আছেন। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'একে ডাকো।' এবং জানলেন যে চিকিৎসার জন্য তিনি সস্ত্রীক লন্ডন যাচ্ছেন। এরশাদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'টাকা-পয়সা আছে?' তারপর পিএসকে বললেন, 'ফরাসউদ্দিন, দেখো তো আমার টাকা-পয়সা থেকে কিছু পেসারার করতে পারো কিনা।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রাজনৈতিক মিত্রের চেয়ে রাজনৈতিক বৈরীর পরিবার-পরিজনের খেয়াল রাখতেন খুব বেশি। একবার অধ্যাপক আবুল ফজল এসে অনুযোগের সুরে বললেন, বঙ্গবন্ধুর রাজত্বে কবি-সাহিত্যিকদের কদর নেই। বিস্মিত বঙ্গবন্ধু বিস্তারিত জানতে চাইলে আবুল ফজল জানালেন, কবি ফররুখ আহমেদ খুব অসুস্থ, সুচিকিৎসার জন্য টাকা-পয়সা নেই। প্রতিভিত্রশীল বলেই কি আজ তার এ অবস্থা? অভিযোগটা শুনে বঙ্গবন্ধু খুব কষ্ট পেয়েছিলেন বটে, তবে অসুস্থ কবির যথাযথ খেয়াল রাখতে তার সরকার যথেষ্ট সচেষ্ট ছিল।

ফরাসউদ্দিন বললেন, আমার কাজের লোকের মা মারা গেছে শুনে তিনি আমায় ডেকে নিয়ে বললেন, 'জানি, তোমার মন ভারি কেন; যাও দাফন-কাফন কিংবা অন্য উদ্দেশ্যে খরচের টাকা নিয়ে যাও।' এক কথায় বলতে গেলে বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন মহাপ্রাণ, যিনি মেসেঞ্জারকে ডাকতেন একসঙ্গে খেতে। আসতে-যেতে নিয়মিত নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের নাম ধরে কাছে ডেকে এনে তাদের ভালো-মন্দের খবর নিতেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই বাঙালি, আমাদের জাতির পিতা।

কথা ছিল ১৫ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে গিয়ে বঙ্গবন্ধু অলিখিত বক্তব্য দেবেন এবং তোয়ার খান মোটা হরফে পলেস্টেজলো কাগজে টুকে দেবেন। বঙ্গবন্ধু সেখানে বললেন শিক্ষার পাশাপাশি গবেষণার গুরুত্বের কথা। বললেন আরো শেরেবাংলা ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ওপর গবেষণা করে তাদের জীবনচরিত তথা দীক্ষা সম্পর্কে সমাক জান নেয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণা দেবেন, যেখানে বেতন কাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থাকবে আন্তর্জাতিক মানের। আমাদের চরম দুর্ভাগ্য যে ঘাতকের গুলি বুক বিদীর্ণ করে সে বলা চিরতরে বন্ধ করে দিল বঙ্গবন্ধু সেখানে পৌঁছানোর আগেই।

ফরাসউদ্দিন বিদেশ যাবেন পড়াশোনা করতে, উচ্চতর ডিগ্রি আনতে। একথা শুনে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'কী পড়তে যাবি, তাও আবার ইংরাজি পরীক্ষা দিয়া। তার চাইতে বরং এক কাম কর, আমি টুঙ্গিপাড়া যাইতেছি, আরো অনেকে যাইব। তুই থিসিস লিখবি আর আমরা সুপারভাইজ করমু।'

বিদেশ যাওয়া উপলক্ষে ছুটিতে থাকলেও নিয়মিত সরকারি কর্তব্য পালন করতেন ফরাসউদ্দিন। বঙ্গবন্ধুর হত্যার খবর শুনে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য একটা রিকশা নিয়ে ছুটলেন ৩২ নম্বরের দিকে। আক্রমেরে কাছে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হলেন, এমনকি দৈহিক নাজেহাল হওয়ার উপক্রম হলো। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে অশ্রুসিক্ত রিকশাচালক ফরাসউদ্দিনকে বললেন, 'ভাবছিলাম আমি পাগল, আপনি তো দেখছি আরো বড় পাগল! এই সময় ৩২ নম্বরে যাওয়া?' বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে চরম ব্যথিত সেই রিকশাওয়ালা ফরাসউদ্দিনকে নামিয়ে ভাড়া না নিয়েই চলে গেলেন।

তিন। বাম চিন্তা-চেতনায় বেড়ে ওঠা এম সায়েদুজ্জামান তৎকালীন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের অন্যতম এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বাংলাদেশে বেশ কয়েকটা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে কাজ করেছেন, এমনকি একসময় অর্থমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন। আপানমন্তক বাঙালি এই ভদ্রলোক দশম শ্রেণী থেকে বঙ্গবন্ধুর ভক্ত হয়ে উঠতে থাকেন। আকর্ষণটা তীব্র হয় বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ১৯৬৬ হালে ছয় দফা পেশের কারণে এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা তুঙ্গে ওঠে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পরপর।

তিনি পাকিস্তান আমলেই বেশ কয়েকজনকে চিঠিয়ে প্রমোশন পেয়েছিলেন। ভাবার বিষয় বটে, একই যদি বাঙালিপ্রীতি, পাকিস্তানিরা কেন প্রমোশন দেবে? কথাটা বঙ্গবন্ধুর কানেও গেল। তাই প্রথম সাক্ষাতেই বঙ্গবন্ধু জানতে চাইলেন, 'এত প্রমোশন কেন?' স্বভাবসুলভ সিদাহাসো সায়েদুজ্জামান জবাব দিলেন, 'স্যার আমার প্রমোশনের জন্য ৫০ শতাংশ আমার মেধা ও দক্ষতা দায়ী আর বাকি ৫০ শতাংশ আপনার অবদান।' বিস্মিত বঙ্গবন্ধু বললেন, 'কীভাবে?' জামান সাহেব জানালেন, 'স্যার, আপনার ছয় দফাকেন্দ্রিক গণ আন্দোলনের ফল আমি পেয়েছিলাম; পশ্চিম পাকিস্তানিরা বোঝাতে চেয়েছিল যে তারা প্রমোশনে পক্ষপাতিত্ব করে না।' বঙ্গবন্ধু হেসে উঠে বললেন, 'বাহ, বেশ তো কথা শিখেছ দেখছি। এখন যাও, নুরুল ইসলামের সাথে দেখা করো; আপাতত পরিকল্পনা ও বহিঃসম্পদ সম্পর্ক বিভাগ দেখভাল করো। খুব ভালো করে কাজ করো। তোমার উপর আমার আস্থা অনেক।'

সায়েদুজ্জামান বললেন, বঙ্গবন্ধুর যুগান্তকারী অর্থনৈতিক চিন্তাচেতনার তিনটা অংশ ছিল, যা সংবিধানের সঙ্গে পুরো সংগতিপূর্ণ—স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ। প্রথমটির কাজ ছে ট্ট ছে প্রয়োজন মেটানো, পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণ প্রভৃতি; মধ্যমেয়াদির মধ্যে ছিল সবার মৌলিক চাহিদা পূরণ, বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণ, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ইত্যাদি। দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের আওতায় খালে স্বয়ম্ভরতা অর্জন, শতইঞ্চি বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি, ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি (২৫ লাখ থেকে তিন কোটি) ইত্যাদি।

১৯৭৫ সালের কথা। পিটার কার্লিগল, বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশে একবার এসেছিলেন একথা বলতে যে বিশেষত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে থাকা বিশ্বব্যাংক অর্থাদির প্রকল্পগুলোর জন্য নেয়া ঋণ পাকিস্তান পরিশোধ করবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের উচিত হবে ওই ঋণের বোঝা বহন করা, নচেৎ খাদ্য সাহায্যসহ অন্যান্য সাহায্য পেতে অসুবিধা হতে পারে। রাগত বঙ্গবন্ধু সোজা দাঁড়িয়ে পাইপটা হাতে নিয়ে পিটার কার্লিগলকে 'আসুন পিটার আসুন' বলে জানালার কাছে নিয়ে গেলেন।

বঙ্গবন্ধু : কী দেখছেন পিটার?

পিটার : সবুজ সুন্দর খাসে ঢাকা একটা লন দেখছি।

বঙ্গবন্ধু : প্রয়োজন হলে আমার দেশের মানুষ ঘাস খেয়ে জীবন কাটাবে, তবু অন্যায় ঋণের বোঝা বা কোনো শর্ত মাথা পেতে নেব না। আমরা ওই ঋণের উত্তরাধিকারী নই।

১৯৭৫ সালে একদিন সচিব রুহুল কুদ্দুস সায়েদুজ্জামানকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে গেলেন। একথা-সেকথার পর রুহুল কুদ্দুস বললেন, 'স্যার, সকাল থেকে রাত অব্দি আপনি অফিস করেন, তারপর ক্লান্ত দেহে বাসায় যান একটু গা এলিয়ে দেয়ার জন্য। এখানে তো নিরাপত্তা প্রায় নিশ্চিত—কয়েক স্তরে বন্দুকধারী পাহারাদার, নিরাপত্তা প্রহরী রয়েছে অথচ আপনার বাসাটা নিরাপত্তার নিরিখে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, নিরাপত্তা বাড়াতে বাসায়ও এ রকম ব্যবস্থা থাকা উচিত বলে আমরা মনে করি।'

বঙ্গবন্ধু তার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'কোনো চিন্তা করবেন না। বাংলাদেশের কেউ আমার গায়ে হাত দেবে না।'

চার। ষাটের দশকে পাকিস্তানে দুই অর্থনীতির অবস্থান নিয়ে রেহমান সোবহানের প্রণীত পর্যালোচনা সরকারি মহলকে যেমন প্রচণ্ড উষ্মিয়া করে তুলত, তেমনি উৎসাহিত করত বিরোধী দলকে। অনেকটা তরুণ বয়সে তিনি বঙ্গবন্ধুর নজর কাড়তে সক্ষম হন। বলেন ছয় দফার খসড়া প্রণয়নে তাত্ত্বিক ভিত্তি তুলে ধরা, তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে পূর্ব-পশ্চিম বৈষম্যের বিকট চেহারা উন্মোচন করা, সত্তরের নির্বাচনে ইশতেহার তৈরিতে অংশ নেয়া, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিদেশে জনসমর্থন আদায়ে নিজেকে নিবেদন করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থেকে বঙ্গবন্ধুর আশীর্বাদপুষ্ট ও বিশ্বাসভাজন হন এবং সম্ভবত সে পথ ধরে নবগঠিত পরিকল্পনা কমিশনের সম্মানিত সদস্য হিসেবে যোগ দেন।

আলোচিত ওয়েবিনারে রেহমান সোবহান মূলত বঙ্গবন্ধুর 'সমাজতন্ত্রী' হয়ে ওঠার গল্পটা তুলে ধরলেন। বঙ্গবন্ধু সবসময় ন্যায়সংগত সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। রাজনীতিবিদ-নীতিনির্ধারক নিয়ে প্রধাণত ধারণা এই যে তারা জনসমুখে বা জনসভায় যা বলেন তা করেন না কিংবা যা করেন তাতে জনপ্রত্যাশার প্রতিফলন থাকে না। বঙ্গবন্ধু ছিলেন ঠিক তার উল্টো। জনসভায় যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসতেন, অফিসে বসে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তৎপর হতেন। ষাটের দশকে, সত্তরের নির্বাচন পর্যন্ত, বাম ধারার লোকেরা মনে করত ছয় দফা মানুষের মুক্তির সনদ নয়; বড়জোর স্বায়ত্তশাসন এবং পাকিস্তানি জুতা পায়ে আর্থসামাজিক উন্নয়ন পরিচালন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন শোষণমুক্ত তথা সমতাভিত্তিক একটা সমাজ বিনির্মাণে। তিনি খোলাখুলি বলতেন, 'আমি কমিউনিস্ট নই কিন্তু সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি।'

রেহমান সোবহান মনে করেন, সত্তর সালের নির্বাচন বঙ্গবন্ধুকে জনগণের অতি কাছে যাওয়ার সুযোগ এনে দিয়েছিল, যার প্রভাব পড়ে ন্যায়সংগত সমাজ প্রতিষ্ঠার মানসে, অভীপ্সা পূরণে। তারপর মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ তার ভাবনাকে যুক্তির শক্ত খুঁটির ওপর দাঁড় করায়। সুতরাং বঙ্গবন্ধুর সমাজতান্ত্রিক দর্শন কোনো বই থেকে আসেনি, বরং জীবন্ত বাস্তবতা থেকে উঠে এসেছে—ফ্রম গিভিং রিয়ালিটি। তিনি মনে করতেন পুঁজিবাদ একটা শোষণমূলক পদ্ধতি, যা পরিত্যাজ্য; তবে একচেটিয়া পুঁজি পরিয়ার করতে হবে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি পুঁজি নয়। একটা সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিই হবে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

পাঁচ। মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে সংগ্রামী ছাত্র নেতা, ডাকসুর ডাকসাইটে ভিপি (৭২-৭৩) ও ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। ছাত্র ইউনিয়ন থেকে গোলন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান সভাপতি এবং তার ভাষায়, 'এখনো আছি সমাজতন্ত্রের ধান্ধায়।'

প্রসঙ্গত, বলা দরকার যে ১৯৭৫ সালের আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর চাউর হওয়া মাত্রই তার সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিবাদী মিছিলের আয়োজন করেন। তার সমর্থকদের নির্দেশ দেন যাতে তারা দাঁড়াবেন দলের ভেতরে থাকা বিশ্বাসঘাতকদের প্রশ্ন ছিল—'এই শুভ জন্মদিনে আপনার কামনা কী?' বঙ্গবন্ধু উত্তর দিলেন, 'বাঙালি জাতির মুক্তি।' তার পরের প্রশ্ন, 'জন্মদিন পালন করবেন কীভাবে?' উত্তর, 'আমি জন্মদিন পালন করি না, আমার জন্মদিনে মোমবাতি জ্বলে না। যে দেশের মানুষ বুভুক্ষু, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতাবঞ্চিত, সেই দেশে আমার জন্মদিন কী আর মৃত্যুদিনইবা কী।' স্বতঃই, ৭ মার্চ ভাষণে বঙ্গবন্ধু মুক্তির কথা আগে বলেছেন, তারপর স্বাধীনতার কথা। সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট প্রশ্ন রেখেছিলেন, 'পাকিস্তানের জেলে কার কথা বেশি মনে পড়েছে আপনার—দেশের মানুষ না পরিবার?' বঙ্গবন্ধু বললেন, 'প্রথমে দেশের মানুষ এবং পরে পরিবার।'

বঙ্গবন্ধু ভারত সফরে গিয়ে ২০ লাখ লোকের মহাসমুদ্র সামনে রেখে ভাষণ দিলেন। এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে যেতে হয়েছিল হেলিকপ্টারে চড়ে। ভাষণ শেষে বললেন, 'বিজ আমি নিয়ে আমি, দেবার কিছু নেই, আছে শুধু ভালোবাসা, দিয়ে গেলাম তাই।' দিল্লে আসার আগে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, 'but before you come, I want to see withdrawal of Indian forces from Bangladesh.' ইন্দিরা গান্ধী এসেছিলেন, রেসকোর্স ময়দানে জাগণ দিয়েছিলেন এবং তার আসার তিনদিন আগে ১২ মার্চ ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ ছাড়ে।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন মহান, মানবদরদি। শত্রু বা মিত্র, নিজ দলের বা অন্য দলের, সবার প্রতি তিনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে যতটুকু সম্ভব সাহায্যের হাত প্রসারিত করতেন। জেলে থাকা রাজনৈতিক বন্দিদের পরিবারের নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন এবং আর্থিক সাহায্য পাঠাতেন। এর জন্য তোফায়েল আহমেদের কাছে থাকত আলাদা তহবিল। একদিন বঙ্গবন্ধু সাহায্যপ্রাপ্তদের তালিকা দেখে উষ্মা প্রকাশ করলেন, কারণ তিনি চাননি যে পুরো নাম লেখা হোক; নাম লিখতে হবে সংক্ষেপে, যাতে কেউ জানতে না পারে। এক হাতের দান অন্য হাত দেখতে নেই—এ বিশ্বাস থেকে কথাটা বলা।

সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুগোস্লাভিয়া, জাতিসংঘ কিংবা কমনওয়েলথ সম্মেলন—যেখানেই গেছেন বঙ্গবন্ধু ছিলেন মধ্যমণি। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, তার কথা শুনতে মুখিয়ে থাকত সবাই। এমন বক্তেগ নেতা খুব বিরল।

আজ তিনি নেই কিন্তু তার কন্যা শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল—খালো উন্নত, দারিদ্র্য তিরক্ষি নিম্নগামী (করোনাকাল ব্যতীত), ডিজিটাল বাংলাদেশ, যার ফলস্বরূপ আজকের সেমিনার; অবিকাংশ খানায় বিদ্যুৎ, ছাতে আছে বেশ কয়েকটা মেগা প্রজেক্ট ইত্যাদি। তবে এ সবকিছুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আমাদের প্রেরণা দিয়েছে তার অবিস্মরণীয় ডাক—এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

আট। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান সমাপনী বক্তব্যে সেমিনারের সারাংশ তুলে ধরে বললেন, বঙ্গবন্ধুর মুখোমুখি হয়ে কথা বলেছিলেন মাত্র একবার। সুপারিয়র সর্ভিস পরীক্ষায় ভালো ফল করে যখন চাকরিতে যোগদানের প্রের গুনছিলেন, ঠিক সে সময় চাউর হয় যে বর্তমান সরকার নিয়োগ দেবে না। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লে সতীর্থরা তাকে প্রতিনিধি হিসেবে উপর মহলে যোগাযোগ করতে বললেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করার অন্যায়সলব্ধ অনুমতি পেয়ে তারুণ্যের তাকতে ছুটে গেলেন পুরনো গণভবনে, কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকতেই দেখলেন সেই মহাপ্রাণ বঙ্গবন্ধু দাঁড়িয়ে কথা বলছেন তোফায়েল আহমেদ ও জনৈক শ্রমিক নেতার সঙ্গে (নুরুল হক)। তরাটি কণ্ঠে অবাক দৃষ্টি ফেলে বঙ্গবন্ধু আগুন্তুককের পরিচয় এবং উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। আব্দুল মান্নান সব কথা প্রকাশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'তোমাদের মতো মেধাবীদের এই মুহূর্তে দেশের প্রয়োজন' বলেই তোফায়েল আহমেদকে ব্যাপারটা দেখতে নির্দেশ দিলেন।

বিভিন্ন জনের স্মৃতিকথায় সেজে একমত হয়ে মাননীয় মন্ত্রী বললেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আচার-আচরণ, কর্মকাণ্ড এবং দৃষ্টিভঙ্গি বাবার বৈশিষ্ট্য বহন করে। যেমন তিনি বাইরে যা বলেন, কোবিনেটে তা নিয়ে আলোচনা করেন, নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে বহুপরিকর বলে থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর কথা ও কাজে গ্রামের দুই জনগণের বিবেচনা অগ্রাধিকার পায়। বাবার মতো তিনিও চান সমবয় ও তেজগারার মতো প্রগতিশীল কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করি।

স্বীকার করতেই হবে যে একটা ন্যায়সংগত বা সমতাভিত্তিক সমাজ এখনো অধরা রয়ে গেছে। হতে পারে সেটা উন্নয়নের মহাসুক্তে ওঠার জন্য যে মডেল আমরা ব্যাবহার করি, তার অবদান। তবে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস দীর্ঘকালীন পরিপ্রেক্ষিতে বৈষম্য হ্রাস পাবে।

সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বলে মাননীয় মন্ত্রী তার বক্তব্য শেষ করেন।

'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান'
-অন্নদাশঙ্কর রায়

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আব্দুল বায়েস : অর্থনীতিবিদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির খণ্ডকালীন শিক্ষক